সংবাদ
তারিখ 20 MAR 2007 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

# শিক্ষানীতি ও সরকারি নীতি

মাহমুদুল বাসার

ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি শিক্ষা আন্দোলনও করতে হয়েছিল বাঙালিদের। ভাষা আন্দোলন হলো '৫২-তে। কিন্তু দশক পরে ১৯৬২তে হলো শিক্ষা আন্দোলন।

দুটি আন্দোলন হয়েছিল পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানি দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে। দৃষ্টিভঙ্গিই আসল। দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হলে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক হলে আমাদের আন্দোলন করার প্রয়োজন হতো না। রক্ত দিতে হতো না।

জিন্নাহ সাহেব অত্যন্ত জোর দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিলেন একটা আক্রোশ থেকে, সেটা সাম্প্রদায়িক আক্রোশ। জিন্নাহ ছিলেন বিখ্যাত ব্যবসায়ীর ছেলে, চোখা ইংরেজি শিক্ষিত, তিনি তো প্রথম জীবনে গান্ধীজির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন যে, গান্ধীজি রাজনীতিতে ধর্মকে মিশ্রিত করেছেন। শুধু নেতা হওয়ার জন্য জিন্নাহ সাহেব অবস্থান পরিবর্তন করলেন। মিশ্রণ না, ধর্মকে রাজনীতির ভিত্তি করে তুললেন। রিলিজিয়নকে ন্যাশন বলে থিওরি দিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করলেন। তাঁতে সাম্প্রদায়িকতা বিষের মতো সমস্ত নীতিতে অর্থাৎ শিক্ষানীতিতেও প্রবেশ করেছিল। জিন্নাহর বশংবদ আর তাঁবেদাররা পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতি উপহার দেবে এটাই স্বাভাবিক।

পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানি শিক্ষানীতিই চাপিয়ে দিয়েছিল। এর আগে ব্রিটিশ সরকারও সাম্রাজ্যবাদী- মতলববাজি শিক্ষানীতি দিয়েছিল। যার সঙ্গে মতপার্থক্য ঘটেছিল রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। ইংরেজ চাচ্ছিল, নেটিভরা ইংরেজি শিখে, ইংরেজি বিদ্যা দিয়ে আরও পোক্তভাবে ধর্মীয় কুসংস্কার আয়ত্ত করুক, তারা চাচ্ছিল- ইংরেজদের তাঁবেদার মওলানা সৃষ্টি হোক।

ইংরেজদের উদ্দেশ্য একেবারে বৃথা যায়নি। জামায়াতি শিক্ষকদের মুখ থেকে বেশ চোখা ইংরেজি বোল বের হয়। তাদের কম্পিউটার আছে, মোবাইল আছে, গাড়ি আছে, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স আছে, রঙিন টিভি আছে। তারা মারাত্মক আপডুডেট। বোরখার নিচে তাদের বিবি-কন্যারা খুবই আধুনিক। তাদের টিভির এন্টেনা মোটেও ছোট নয়, আকাশস্পর্শী।

অথচ রাজনীতির মঞ্চে এসে বলে, 'আল্লাহর আইন কায়েম করবে।' সেক্যুলার শিক্ষানীতির কথা শুনলে মাথায় রক্ত উঠে যায় তাদের। তারা শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতিকে ধর্মের মধ্যে ঢুকাতে চায়।

ইংরেজরা তাদের শিক্ষানীতি দিয়ে এমনই ইংরেজি শিক্ষিত, ভোগবাদী মওলানার জন্ম দিতে চেয়েছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখন এসব কট্টর, মৌলবাদীর জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। লাদেনের সঙ্গে বুশদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল, পত্রিকা মারফত তা জেনেছি। আমাদের শিক্ষা খাতে সাম্রাজ্যবাদের টাকাই বরাদ্দ দেয়া হয়।

যাক আগের কথা, ইংরেজ সরকার মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা এবং হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন হয়েছিল। ইংরেজরা উভয় সম্প্রদায়কে ধর্ম শিক্ষা দিতে উৎসাহ দিয়েছিল। তারা চাচ্ছিল ইংরেজি শিক্ষিত মৌলবাদ গোষ্ঠী সৃষ্টি হোক। আধুনিক ইউরোপের যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার প্রসার তারা চাননি। বাঙালি বিদ্যাসাগর এর প্রতিবাদ করেছিলেন। প্রথমত, তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার মাধ্যম হোক মাতৃভাষা, তারপর বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তে ইউরোপের বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা পাঠ্যসূচিতে স্থান দেয়ার সুপারিশ করেছিলেন।

১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৭৯১ সালে জোনাথন ডানকান বেনারসে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষায় বেদবেদান্ত পড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাদ্রাসায় পড়ানো হবে আরবি। ওয়ারেন হেস্টিংস বলেছিলেন, 'আদালতের কর্মকর্তাদের যেসব পদ খালি হবে সেগুলোতে মাদ্রাসার সার্টিফিকেটধারী যোগ্য লোকদের নিয়োগ দিতে হবে।'

ইংরেজদের এ শিক্ষানীতি চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, 'যদি এ দেশকে অন্ধকারে রাখাই হয় ব্রিটিশ আইন সভার পলিসি, তা হলে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে বেছে নেয়া হয়েছে।'

বিদ্যাসাগর আরও বললেন, সভ্য ইংরেজ সাহেবেরা যদি শাস্ত্র পড়ার উস্কানি দেয় তা হলে দেশবাসী কুসংস্কারকে আরও গভীরভাবে জাপ্টে ধরবে। ভাববে বিজ্ঞানের নয়, শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে।

তখন বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো সচেতন, ব্যক্তিত্ববান মনীষী ছিল না বলেই ইংরেজদের চক্রান্তকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কথা বলেনি কেউ।

নওয়াব আবদুল লতিফরা ইংরেজদের সমর্থক ছিলেন, ইংরেজি শিক্ষার পক্ষেও ছিলেন। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার পক্ষপাতি ছিলেন না। এদের সম্পর্কেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, 'লালসালু' উপন্যাসে বলেছেন, 'এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়তো একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশী পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নতুন খোলসপরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।' অর্থাৎ খোলসটা ইংরেজের, মনটা মৌলবাদী।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল দর্শনই ছিল সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মের নৈতিক, কল্যাণকর, সাম্রাজ্যবাদী দিকটি নয়, শোষণের হাতিয়ার করেছিল তারা ধর্মকে। বাঙালি জাতিকে পঙ্গু, মূর্খ, নিরক্ষর বানানোর উদ্দেশে উর্দু, আরবি ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। রোমান হরফ চাপাতে চেয়েছিল ওই একই দৃষ্টিতে- সৃজ্যমান বাঙালিকে মেরুদণ্ডহীন করে দিতে হবে। আইয়ুব খানের শরিফ কমিশনে বলা হয়েছে, 'আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজির বিরাট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেই জন্য ষষ্ঠ শ্রেণী হতে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক পড়া হিসেবে শিক্ষা দিতে হইবে।'

এবং 'উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় পরিণত করিতে হইবে।'

শরিফ কমিশনের সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা হলো- 'পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার জন্য যদি একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তন করিতেই হয়, তাহলে পবিত্র কোরান যাহাতে লেখা এবং যাহা সকল মুসলমানই পাঠ করে সেই আরবীয় দাবি কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।'

আইয়ুব খানের শিক্ষক এসএম শরীফ চেয়েছিলেন বাঙালিকে ইংরেজি শিক্ষিত মৌলবাদী বানাতে ইংরেজদের স্টাইলে। তাই আরবি হরফ প্রবর্তনের ফতোয়া দিয়েছিলেন। ছাত্ররাও রক্ত দিয়ে এই মতলব রুখে দিয়েছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিটির প্রধান ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ ড. কুদরত-ই-খুদা। সদস্য ছিলেন- ড. আনিসুজ্জামান এবং কবীর চৌধুরীর মতো বরেণ্য বুদ্ধিজীবী। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ একজন বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও মুক্তবুদ্ধির চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন।

খুদা কমিশন রিপোর্টেরও সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন, কেউ কেউ। থাকতেই পারে। কিন্তু আইয়ুব খানের শরিফ কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর খুদা কমিশনের মৌলিক প্রভেদ এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়।

শরিফ কমিশনের রিপোর্টের শিক্ষাকে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িকতা নির্ভর করা হয়েছিল। সেখানে ফুটে উঠেছিল মুসলমানিত্ব, সেখানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল কোরানের ভাষা আরবীকে আর উর্দুকে। ছাত্ররা আন্দোলন করেছিল সাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাহাত্তরের সংবিধানে সম্পৃক্ত চার মূলনীতির আলোকে খুদা কমিশন রিপোর্ট প্রণীত হয়েছিল। তাতে সুস্পষ্টভাবে সেক্যুলার শিক্ষানীতির কথা বলা হয়েছিল। এই রিপোর্টে কোন ধর্মীয় পক্ষপাতকে প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে বিকল্পহীনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রক্তাক্ত পটপরিবর্তনের পর সামরিক শাসকরা ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বিলোপ ঘটিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যেমন রাষ্ট্রনীতি তেমনি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। প্রত্যেক সরকারই শিক্ষানীতি তৈরি করেছে। তাতে প্রত্যেক সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

ড. মজিদ খানের শিক্ষানীতির কথাই যদি ধরি তাহলে পাব- জেনারেল জিয়ার বিদেশ থেকে আমদানিকৃত শিক্ষামন্ত্রী ড. মজিদ খান এসেই ধর্ম শিক্ষা এবং আরবী ভাষা স্কুলে বাধ্যতামূলক করার নীতি ঘোষণা করেন। (খালেকুজ্জামান- শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে - পৃ. ৫৫)।

আমরা লক্ষ্য করব যে, স্বৈরাচারী সরকারগুলো মাদ্রাসায় গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে সমান্তরালগতিতে, রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষানীতির মধ্যে ঢুকিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। তাই দেখি আইয়ুব খানের হাত দিয়ে এসেছিল শরিফ কমিশনের রিপোর্ট। আর জিয়া এরশাদের হাত দিয়ে এসেছে মজিদ খানের রিপোর্ট। শিক্ষা আন্দোলন দিয়েই আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তেমনি মজিদ খানের শিক্ষা নীতির বিরোধিতা দিয়ে শুরু হয়েছিল এরশাদবিরোধী আন্দোলন।

দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি জাতি আন্দোলন করে যাচ্ছে একটি অভিন্ন শিক্ষানীতির জন্য; সেখানে আমাদের বর্তমান দুই কৃতী শিক্ষামন্ত্রী তৈরি করলেন এক জগাখিচুড়ি শিক্ষানীতি। যার নাম দিয়েছেন 'একমুখী শিক্ষানীতি'। শিক্ষা নিয়ে তুঘলকী কাণ্ড কাকে বলে!

বাংলাভাই, শায়খ আবদুর রহমান, মুফতি হান্নানদের প্রশ্রয়দাতা জোট সরকার- যারা